International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-II, Issue-V, March 2016, Page No. 01-08
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে : অন্তরঙ্গ পাঠ

Dr. Goutam Kumar Nag
Associate Professor (French) & H.O.D, Dept. of Foreign Languages, University of Burdwan, Burdwan, West Bengal, India

Abstract

The aim of the present paper is to analyze the salient linguistic features of one of the most popular songs of Tagore : āguner paraśmaṇi .The study is limited to the poetical framework of the song ; the musical aspect is excluded. The song is built on the underlying theme of purification of soul through suffering and pain, symbolized by the imagery of fire and the attainment of the state of enlightenment with the end of conflict of light and darkness. In this article through an in depth study of the constituent elements, we have tried to demonstrate how the theme has been developed at various levels: lexical, morpho-syntactic, and semantic.

Key Words: purification, light, darkness, Tgore's song, linguistic features.

এই নিবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের একটি সুপরিচিত গানের অন্তরঙ্গ ও ভিন্নতর পাঠ : আগুনের পরশমণি ছোঁওয়াও প্রাণে (পূজা /২১২)। সাঙ্গীতিক রূপটি নয়, গানের কাব্যরূপটি আমাদের আলোচ্য। এই গানের কাব্য অবয়বের সৌন্দর্য আস্বাদনের লক্ষ্যে আমরা এর বিভিন্ন গঠক উপাদান বিশ্লেষণ করব : শব্দচয়ন, পদসমূহের পারস্পরিক অন্বয়, বাক্যের গঠনকৌশল, বিভিন্ন ব্যাকরণগত উপাদানের ব্যবহার।

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন পুণ্য করো দহন-দানে ॥
আমার এই দেহখানি তুলে ধরো,
তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো--
নিশিদিন আলোক-শিখা জ্বলুক গানে ॥
আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব
সারা রাত ফোটাক তারা নব নব।
নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো,
যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো---
ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে ঊর্ধ্ব-পানে ॥[১]

বিস্তারিত বিশ্লেষণে যাওয়ার আগে আমরা গানের কাব্য অবয়বের যে বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রাথমিক পাঠে ধরা পড়ে তার সংক্ষিপ্ত পর্যালচনা করব : প্রথমে গঠক উপাদানগুলির রূপগত বৈশিষ্ট্য, তারপর তাদের আর্থ বৈশিষ্ট্য।

কলির সংখ্যায় একটা চক্রাকার আবর্তন ধরা পড়ে। আস্থায়ী, অন্তরা সঞ্চারী, আভোগ - চারটি তুকের কলির সংখ্যা যথাক্রমে দুই, তিন, দুই,তিন। আমাদের আলোচনার জন্য আমরা দশ কলিবিশিষ্ট গানটিকে দুটি অর্ধাংশে বিভক্ত করেছি। গানের প্রথমার্ধরূপে আমরা অভিহিত করব গানের প্রথম পাঁচটি কলিকে অর্থাৎ আস্থায়ী ও অন্তরা অংশদুটিকে ; পরবর্তী পাঁচটি কলিকে অর্থাৎ সঞ্চারী ও আভোগ অংশদুটিকে গানের দ্বিতীয়ার্ধরূপে চিহ্নিত করব।

কলি ও বাক্যের বিন্যাসে সঞ্চারীর ব্যতিক্রমী চরিত্রটি ধরা পড়ে। অন্য তিনটি তুকে প্রতিটি কলিই এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বাক্য। শুধু সঞ্চারীতে একটি বাক্য দুটি কলিতে বিস্তৃত।

দশকলিবিশিষ্ট এই গানে ক্রিয়াপদের সংখ্যাও দশ। তবে সব কলিতে সমসংখ্যক ক্রিয়ার প্রয়োগ ঘটে নি। গানের প্রথমার্ধে প্রতিটি কলিতে একটি ক্রিয়াপদ। কিন্তু এই সংখ্যাবিন্যাস গানের দ্বিতীয়ার্ধে রক্ষিত হয় নি। এখানেও প্রথমে সঞ্চারী অংশের ব্যতিক্রমী চরিত্রটি ধরা পড়ে। এই তুকের প্রথম কলিটি অর্থাৎ গানের ষষ্ঠ কলিটি ক্রিয়াপদবিহীন। সেইসঙ্গে ব্যতিক্রমী আভোগের দ্বিতীয় কলিটি অর্থাৎ গানের অষ্টম কলিটি –
দ্বিতীয়ার্ধের প্রথমে অনুপস্থিতির কারণে এই কলিতে দুটি ক্রিয়াপদ প্রযুক্ত হয়েছে।

ক্রিয়াপদসমূহের রূপগত বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে একটা বৈষম্য চোখে পড়ে। দশটির মধ্যে প্রথম ছটি ক্রিয়ার অনুজ্ঞারূপ ব্যবহৃত হয়েছে। সমগ্র প্রথমার্ধ এবং দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দুই কলি জুড়ে এই প্রয়োগ। পরবর্তী আভোগ অংশে অর্থাৎ গানের দ্বিতীয়ার্ধের তিন-পঞ্চমাংশ জুড়ে উপস্থিত চারটি ক্রিয়ার সাধারণ ভবিষ্যতের রূপ ব্যবহৃত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে গানের বৃহত্তর অংশ জুড়ে উচ্চারিত হয়েছে প্রার্থনা। অনুজ্ঞা এবং সাধারণ ভবিষ্যতের প্রয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে বিস্তারিত আলোচনার সময় দেখতে হবে গানের শেষাংশে কি প্রথম অংশে ব্যক্ত প্রার্থনার রূপায়ণের আশ্বাস রয়েছে।

সর্বনামের প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র উত্তমপুরুষ ও মধ্যমপুরুষের সমবন্ধপদের রূপ ব্যবহৃত হয়েছে। গানের প্রথমার্ধে ব্যবহৃত হয়েছে গদ্যরূপ "আমার" "তোমার" ; দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবহৃত হয়েছে পদ্যরূপ "তব" "মোর"।

শব্দচয়নের ক্ষেত্রে আর্থস্তরে একটা অন্তর্লীন ঐক্য ফুটে ওঠে। গানের শুরুতে "আগুন" - সেই আগুনের অনুষঙ্গবাহী বিশেষ্য ও ক্রিয়া সমগ্র গানে। দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম কলিতে "দহনদান", "প্রদীপ" ও "আলোকশিখা" বিশেষ্যগুলি একই আর্থশ্রেণিভুক্ত। ক্রিয়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সমান্তরালতা চোখে পড়ে । পঞ্চম ও দশম কলিতে অর্থাৎ প্রথমার্ধের শেষ কলিতে এবং দ্বিতীয়ার্ধেরও শেষ কলিতে আসছে একই শ্রেণিভুক্ত ক্রিয়াপদ "জ্বলা" — জ্বলুক / উঠবে জ্বলে। একই শ্রেণিভুক্ত না হলেও "আগুন"এর সঙ্গে সম্পৃক্ত নবম কলিতে "আলো" এবং "আলো"র সঙ্গে সম্পৃক্ত "তারা"। একইসঙ্গে সম্পূর্ণ বিপরীত শ্রেণিভুক্ত অন্ধকারদ্যোতক শব্দের উপস্থিতি গানের দ্বিতীয়ার্ধে — ষষ্ঠ কলিতে "আঁধার", সপ্তম কলিতে "সারারাত" এবং অষ্টম কলিতে "কালো"। প্রাথমিক পাঠেই একটা বৈপরীত্যের আভাস পাওয়া যায় — আলো- আঁধারের বৈপরীত্য। এরপর লক্ষণীয় স্পর্শদ্যোতক শব্দের পুনরাববৃত্তি : গানের প্রথম কলিতে "পরশমণি" এবং ক্রিয়া "ছোঁওয়াও" এবং ষষ্ঠ কলিতে "পরশ"। এছাড়া তৃতীয় কলিতে ক্রিয়াপদ "তুলে ধর" এবং গানের শেষ কলিতে ক্রিয়াপদ " উঠবে" এবং "ঊর্ধ্বপানে" — এই তিনটি পদের মধ্যে দিয়ে একটা উত্তরণের চিত্ররূপ ফুটে ওঠে।

"আগুন" — "স্পর্শ" — "আলো-আঁধারের বৈপরীত্য — উত্তরণ — শব্দাবলীর শ্রেণিবিন্যাসের এই ভিত্তি থেকে গানের মর্মবস্তু সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক ধারণা করা যেতে পারে। জীবনের দুঃখ আঘাতের মধ্যে নিহিত আছে পরম মঙ্গলময় ঈশ্বরের কল্যাণস্পর্শ। দুঃখবেদনার দহন সব কলুষ, সব গ্লানি দূর করে দিয়ে চিত্তশুদ্ধি ঘটায়, ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে পবিত্র করে। দুঃখ আঘাতের মধ্য দিয়েই আত্মশক্তির, সহজাত গুণাবলীর পূর্ণবিকাশ ঘটে। তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ দীপ্তিতে সমুদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সকল জীবন, সকল হৃদয়প্রাণ। জীবনে দুঃখবেদনার এই ভূমিকার চিত্রায়ণে আগুনের রূপকল্পের ব্যবহার আমরা রবীন্দ্রনাথের বহু গানে দেখি। এইসমস্ত গানে কোথাও দুঃখমোচনের কোন প্রার্থনা উচ্চারিত হয় নি ; দুঃখ আঘাতকে তিনি লীলাময় ঈশ্বরের পরমদান রূপে সাদরে বরণ করে নিয়েছেন। তেমন কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

এই করেছ ভালো, নিঠুর হে, নিঠুর হে, এই করেছ ভালো।
এমনি ক'রে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো ।।
আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয় না কিছুই আলো।[২]

তুমি এবার আমায় লহো হে নাথ, লহো।
.....
কত কলুষ কত ফাঁকি এখনো যে আছে বাকি
মনের গোপনে,

আমায় তার লাগি আর ফিরায়ো না---
তারে আগুন দিয়ে দহো ।।[৩]

দুঃখ যদি না পাবে তো দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে ?
বিষকে বিষের দাহ দিয়ে দহন করে মারতে হবে।
জ্বলতে দে তোর আগুনটারে, ভয় কিছু না করিস তারে,
ছাই হয়ে সে নিভবে যখন জ্বলবে না আর কভু তবে। [৪]

আরো আঘাত সইবে আমার, সইবে আমারো।
.....
জ্ব'লে উঠুক সকল হুতাশ, গর্জি উঠুক সকল বাতাস,
জাগিয়ে দিয়ে সকল আকাশ পূর্ণতা বিস্তারো ॥ [৫]

শুধু পূজা পর্যায়ের গানেই নয়, দুঃখের এমন মহিমামণ্ডিত অগ্নিময় রূপ দেখা যায় প্রেম পর্যায়ের গানেও

দুঃখের যজ্ঞ-অনল-জ্বলনে জন্মে যে প্রেম
দীপ্ত সে হেম—
নিত্য সে নিঃসংশয়,
গৌরব তার অক্ষয়।।[৬]

সুতীব্র আঘাতের মধ্যেও কবি পরম করুণাময়েরই মঙ্গলস্পর্শ অনুভব করেন :

দুখসঙ্কটে পরশ পাই তব মঙ্গলহাত ॥[৭]

এবার আমরা দেখব এই ভাববস্তুকে ভিত্তি করে কিভাবে কবি কিভাবে এই গানের কাব্য অবয়ব নির্মাণ করেছেন। দুঃখযন্ত্রণার প্রতীকরূপে, আত্মশুদ্ধির প্রতীকরূপে আগুনের রূপকল্পের প্রয়োগে অভিনবত্ব নেই; এই প্রয়োগকে একান্তভাবে রাবীন্দ্রিক বলা চলে না। অভিনবত্ব রূপকের নির্মাণপদ্ধতিতে। এই গানে আগুন রূপক ; কেবল উপমানরূপে আগুনের উপস্থিতি, উপমেয় সম্পূর্ণভাবে অন্তরালে থেকে গেছে। কিন্তু রূপক "আগুন" নয়, "আগুনের পরশমণি"। দুঃখজ্বালার মধ্য দিয়ে উত্তরণের অনুষঙ্গবাহী আগুনের উপর আরোপ করা হয়েছে সমতুল অনুষঙ্গবাহী এক কল্পবস্তুর বৈশিষ্ট্য। অন্যভাবে বলা যায় উপমান বা প্রতীক আগুনকে উপমিত করা হয়েছে আর একটি উপমান বা প্রতীকের দ্বারা। এমন দ্বিমাত্রিক রূপক বা প্রতীক নির্মাণের দৃষ্টান্ত বিরল।

রবীন্দ্রনাথের গানে পরশমণির রূপকল্পের প্রয়োগের সামগ্রিক পর্যালোচনা করলে আমাদের পূর্ববর্তী বক্তব্যের সমর্থন মিলবে। আমাদের আলোচ্য গানটিতে ছাড়া গীতবিতানে এই শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে মোট তিনবার ---একটি পুজাপর্যায়ের গানে, দুটি প্রকৃতিপর্যায়ের গানে। উল্লেখ্য আমাদের আলোচ্য গানের মত সবক্ষেত্রেই এই প্রয়োগ প্রতীকী। কবিতায় যেমন দেখা যায় স্পর্শমণির স্পর্শে অন্য ধাতুর স্বর্ণে রূপান্তর ঘটেছে, (উল্লেখ্য "পরশপাথর" বা "স্পর্শমণি" কবিতা দুটি) তেমন দৃষ্টান্ত গানে পাওয়া যায় না। তার স্পর্শ মেলে আমাদের আলোচ্য গানের মত প্রাণে অথবা হৃদয়ের অনুভূতিতে।
পূজা পর্যায়ের গানে এই প্রয়োগের উদাহরণ :

তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি,
.....
দুখের পরে পরম দুখে, তারি চরণ বাজে বুকে,
সুখে কখন বুলিয়ে সে দেয় **পরশমণি**।
সে যে আসে, আসে, আসে।।[৮]

প্রকৃতিপর্যায়ের শরৎ উপপর্যায়ের গানের দৃষ্টান্ত

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা গেঁথেছি শেফালিমালা—
.....
রহিয়া রহিয়া যে **পরশমণি** ঝলকে অলককোণে

পলকের তরে সকরুণ করে বুলায়ো বুলায়ো মনে---
সোনা হয়ে যাবে সকল ভাবনা, আঁধার হইবে আলা ॥[৯]

সবশেষে বসন্ত উপপর্যায়ের গানের দৃষ্টান্ত :
ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে।

.....
তোমারি মতো আমারো উত্তরী
আগুন রঙে দিয়ো রঙিন করি
অন্তরবি লাগাক **পরশমণি**
প্রাণের মম শেষের সম্বলে॥ [১০]

উপরোক্ত তিনটি গানে পরশমণির ভূমিকা নিয়েছে যথাক্রমে অদৃশ্য আগন্তুকের চরণধ্বনি, শারদসৌন্দর্য, এবং বসন্তসন্ধ্যায় অস্তগামী সূর্যের শেষ কিরণছটা। কিন্তু কোনক্ষেত্রেই পরশমণির সঙ্গে তাদের উপমান-উপমেয় সম্বন্ধ নির্দেশ করা হয় নি। পরশমণির সঙ্গে কোন সম্বন্ধপদ যুক্ত হয় নি। পরশমণির সমার্থক "পরশমাণিক" শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায় একটি গানে :

দে পড়ে দে আমায় তোরা কী কথা আজ লিখেছে সে।
তার দূরের বাণীর **পরশমাণিক** লাগুক আমার প্রাণে এসে॥[১১]

এই গানেই শুধু আমরা দেখি উপমান "পরশমণি"র সঙ্গে উপমেয়ের সম্বন্ধ সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হয়েছে।

সব প্রয়োগের পর্যালোচনার পর এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে আমাদের আলোচ্য গানটি বাদ দিলে উপমান বা রূপক "পরশমণি"কে আর কোথাও অন্য রূপকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয় নি। "আগুনের পরশমণি" --- গানের শুরুর এই শব্দবন্ধের মধ্যেই বিধৃত এক অভিনব নির্মাণকৌশল। আগুনের প্রত্যক্ষ পরশের মধ্যে যে দীর্ঘ জ্বালাময় অনুভূতি রয়েছে, আগুনের স্পর্শমণিতে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে তা হয়ে ওঠে এক চকিত ঐন্দ্রজালিক স্পর্শ --- আগুনকে প্রতীকরূপে ব্যবহার করে রচিত অন্য গানে যা অনুপস্থিত।

অগ্নিময় স্পর্শের উপর ভিত্তি করে রচিত গানের প্রথমার্ধে একটা স্পষ্ট স্থাপত্যকৌশল ফুটে ওঠে। প্রথম চারটি কলির প্রতিটিতে ক্রিয়ার মধ্যমপুরুষের অনুজ্ঞারূপ ব্যবহৃত হয়েছে। পরম করুণাময়ের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা উচ্চারিত হয়েছে। একটি কলিতে এই প্রার্থনা স্পর্শের, পরবর্তী কলিতে প্রার্থনা রূপান্তরের। গানের প্রথম কলিতে আছে স্পর্শদ্যোতক ক্রিয়া "ছোঁওয়া"। দ্বিতীয় কলিতে সেই স্পর্শে রূপান্তর ঘটছে ---- গ্লানিময় জীবন নিষ্কলুষ পবিত্রতায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠছে। তারপর তৃতীয় কলিতে আছে ক্রিয়া "তুলে ধরা"। প্রাথমিকভাবে এই ক্রিয়া স্পর্শদ্যোতক নয়। কিন্তু এই ক্রিয়ার মধ্যেও বিজড়িত আছে "স্পর্শ"। এই স্পর্শের ফলে দেহ হয়ে ওঠে পূজার প্রদীপ। প্রথমার্ধের চারপঞ্চমাংশ জুড়েই এই পর্যায়নুক্রমিক স্পর্শ - রূপান্তরের প্রক্রিয়া ; পার্থক্য পরিসরের। প্রথম দুটি কলিতে এই স্পর্শ-রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি ঘটছে অমূর্ত স্তরে, পরবর্তী দুটি কলিতে মূর্ত স্তরে। প্রথম কলিতে স্পর্শ লাগছে "প্রাণে"; রূপান্তর ঘটছে জীবনে --- এই রূপান্তর কোন সুস্পষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহী রূপ পরিগ্রহ করে না। অন্যদিকে তৃতীয় কলিতে স্পর্শ শরীরী স্পর্শ; পরবর্তী কলিতে চিত্রিত রূপান্তর একটি ইন্দ্রিয়চেতনাগ্রাহ্য রূপান্তর।

এই চার কলিতে নির্দেশকের প্রয়োগ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমে স্পর্শের আধার প্রাণের সঙ্গে কোন নির্দেশক (determinant) ব্যবহৃত হয় নি। স্পর্শের জন্য ব্যাকুল প্রাণ--- তখনও ব্যক্তিপ্রাণ আর বিশ্বপ্রাণে কোন বিভাজন গড়ে ওঠে নি। তারপর "জীবন"এর সঙ্গে নির্দেশাত্মক বিশেষণ "এ"। কিন্তু এখনও কোন সম্বন্ধপদ আসে নি। এরপর "দেহ" এর সঙ্গে আসে দুটি নির্দেশক --- প্রথমে উত্তমপুরুষের সম্বন্ধপদের রূপ "আমার", তারপর নির্দেশাত্মক বিশেষণ "এই"। এই দেহ অহংবোধের আধার, ক্ষুদ্র "আমি"র প্রতীক। ঠিক পরবর্তী কলিতে সমান্তরাল অবস্থানে আসে মধ্যমপুরুষের সম্বন্ধপদের রূপ "তোমার" এবং দূরত্বদ্যোতক নির্দেশাত্মক বিশেষণ "ওই"। "আমার এই" / "তোমার ওই" --- নির্দেশক যুগলের এই প্রতিসম অবস্থান এক আত্মনিবেদনের সাধনার প্রস্তুতির সঙ্কেতবাহী। যা কিছু "আমার" তাকেই সম্পূর্ণভাবে "তোমার" করে দেওয়ার প্রয়াস এই কলিযুগলে প্রতিভাসিত। এই ক্ষুদ্র আমির অবলুপ্তি ঘটে।

দেহের প্রদীপে রূপান্তর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কবির ব্যক্তিসত্তার মূর্ত বস্তুতে রূপান্তরের দৃষ্টান্ত অন্যান্য গানেও পাই। প্রদীপে রূপান্তরের দৃষ্টান্ত :

অরূপ, তোমার বাণী

.....

নিত্যকালের উৎসব তব বিশ্বের দীপালিকা--
আমি শুধু তারি মাটির প্রদীপ, জ্বালাও তাহার শিখা
নির্বাণহীন আলোকদীপ্ত তোমার ইচ্ছাখানি ॥[১২]

এই রূপান্তরের আরও অভিব্যক্তি দেখা যায়। কখনও এই রূপান্তর বরণডালায় :

আমার অভিমানের বদলে আজ নেব তোমার মালা।

.....

সেই-যে আমার কাছে আমি ছিল সবার চেয়ে দামি
তারে উজাড় করে **সাজিয়ে দিলেম তোমার বরণডালা**॥[১৩]

কখনও রূপান্তর ঘটে বাদ্যযন্ত্রে :

আমারে করো তোমার বীণা, লহো গো লহো তুলে। [১৪]

রূপান্তরিত বস্তু যাই হোক, রূপান্তরের তাৎপর্য সমস্ত ক্ষেত্রে একই --- আমিত্বের পূর্ণ বিসর্জন, পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন। আমাদের আলোচ্য গানে রূপান্তর ঘটেছে সমগ্র কবিসত্তার নয়, দেহের। যে দেহ সব ভোগবাসনার আধার, যে দেহ ক্ষুদ্র আমিত্ববোধের উৎস, সেই দেহ রূপান্তরিত হয় পূজার উপকরণে। এমনি করেই কবির আত্মনিবেদন চরম সীমায় উপনীত হয়। পূজাদীপ প্রস্তুত , পূর্ববর্তী পরশ রূপান্তরের প্রক্রিয়ার পর এবার পবিত্র অগ্নিপ্রজ্বলনের লগ্ন সমাগত। পূর্ববর্তী অংশের মত এই শেষ কলিতেও প্রার্থনা অভিব্যক্ত হয়েছে ---দীপ জ্বালার প্রার্থনা। কিন্তু এই প্রার্থনার একটা চরিত্রগত পার্থক্য আছে। পূর্ববর্তী অংশের মত ক্রিয়ার অনুজ্ঞারূপ ব্যবহৃত হলেও এই কলিতে মধ্যমপুরুষের পরিবর্তে প্রথমপুরুষের রূপ ব্যবহৃত হয়েছে। এবার যার উদ্দেশ্যে এই প্রার্থনা, সেই প্রার্থনাপূরণকারী সম্পূর্ণভাবে অন্তরালে চলে যান, কবির ভাবনা সম্পূর্ণভাবে আলোকশিখাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।

এই কলির স্বাতন্ত্র্য ক্রিয়ার করণের ব্যবহারে : জ্বলুক "গানে"। এই প্রদীপ থেকে শুধু আলোর বিচ্ছুরন ঘটে না, সুরের বিস্তারও ঘটে। দৃশ্য ও ধ্বনির মধ্যবর্তী সমস্ত ব্যবধান ঘুচে যায়, প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা সঙ্গীতময় হয়ে ওঠে।

প্রাথমিক পর্যালোচনাতে আমরা দেখেছিলাম শব্দচয়নের স্তরে একটা আলো-আঁধারের বৈপরীত্যের চিত্র আভাসিত রয়েছে। কিন্তু বিপ্রতীপের সেই দ্বন্দ্ব প্রথমার্ধে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এই অংশ জুড়ে বিরাজিত এক আলোকদীপ্ত আবহ --- অন্ধকারের লেশমাত্র সেখানে নেই। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। প্রথমার্ধের শুরুতে "আগুন", দ্বিতীয়ার্ধে সমান্তরাল অবস্থানে "আঁধার" --- উভয়েরই সম্বন্ধপদের রূপটি ব্যবহৃত হয়েছে। অনির্বাণ দীপশিখায় সমুদ্ভাসিত এক পরিমণ্ডল থেকে আমরা প্রবেশ করি এক ভিন্নতর পরিমণ্ডলে --- এক অন্ধকারঘন পরিসরে।

পূর্ববর্তী পর্বের নিরবচ্ছিন্ন আলোকবিচ্ছুরণ এই পর্বের শুরুর অন্ধকারকে নিবিড়তর করে তোলে। সেইসঙ্গে বিস্তৃতিদ্যোতক দ্বিরুক্ত শব্দবন্ধ "গায়ে গায়ে"র প্রয়োগে সেই আঁধার বিপুল পরিব্যাপ্তি লাভ করে। তারপর যে পরশ আসে প্রথমেই তার স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না কারণ এই "পরশ"এর পূর্বে কোন নির্দেশক বা সম্বন্ধপদ নেই। অবশেষে কলির শেষপ্রান্তে আসে "তব"। ঠিক পূর্ববর্তী কলিতে সাময়িক অনুপস্থিতির পর মধ্যমপুরুষের পুনরাবির্ভাব, এবং তার অবস্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । যাকে উদ্দেশ্য করে প্রথম চার কলিতে প্রার্থনা উচ্চারিত হয়েছে, সম্ভাষিত সেই অরূপ সত্তার সঙ্গে যোগাযোগ পঞ্চম কলিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তারপর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে অন্ধকারের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যবধান যেন দীর্ঘতর হয়ে যায়। কিন্তু শেষে "তব"র আবির্ভাবে আবার তাঁকে ফিরে পাওয়া যায় : তাঁর উপস্থিতি তাঁর "পরশ"-এর মধ্য দিয়েই অনুভূত হয়। এই শব্দের উপস্থিতি কলির শেষে হওয়ায় সেই মুহূর্তটি বিলম্বিত হয়, প্রতীক্ষা দীর্ঘায়িত হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁকে পাওয়া আরও নিবিড় হয়ে ওঠে। এবার আর "আগুনের পরশমণি"র স্পর্শ নয়, অন্য আর কোন স্পর্শ নয়, এ স্পর্শ প্রত্যক্ষভাবে "তব পরশ"। যে অন্ধকারের বিস্তার ঘটেছিল, সেই অন্ধকার জুড়ে বিস্তৃত হয়ে যায় এই পরশ।

পরবর্তী কলির শুরুতে আবার আসে রাত। আবার কলির শেষে আসে নক্ষত্ররাজির আলোকরেখা। দুই কলিতে বিস্তৃত এই বাক্যে ক্রিয়ার ("ফোটাক") সঙ্গে কর্তা ও কর্মের সম্বন্ধটি বিশেষভাবে পর্যালোচনাযোগ্য। "তব পরশ" এবং "নব নব তারা" দুটি শব্দবন্ধই ক্রিয়ার কর্তা অথবা কর্মের ভূমিকা পালন করতে পারে। অর্থাৎ একটি ব্যাখ্যা অনুসারে এই পরশ নূতন নূতন তারা ফুটিয়ে তুলছে ; দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুসারে নূতন নূতন তারারা সেই পরশকে ফুটিয়ে তুলছে। দুটি ব্যাখ্যাই সমান গ্রহণযোগ্য। পরশ আর নক্ষত্রের দ্যুতি যেন একাত্ম হয়ে যায় --- পরশ হয়ে ওঠে এক আলোকস্পর্শ। সঞ্চারীর দ্বিতীয় কলিতে যেমন রাত আর নব নব তারার অবস্থানে চিত্রায়িত হয় আলো আঁধারের দ্বন্দ্ব, তেমনিভাবে প্রথম কলিতেও একপ্রান্তে আঁধার এবং শেষপ্রান্তে পরশের অবস্থানে সেই একই দ্বন্দ্ব ফুটে ওঠে। এককথায় সমগ্র সঞ্চারী জুড়ে মূর্ত হয়ে ওঠে আলো-আঁধারের দ্বৈরথ। স্তম্ভাকার পাঠে দেখা যাচ্ছে প্রতিসম অবস্থানে বামদিকে অন্ধকারদ্যোতক শব্দাবলী আর ডানদিকে আলোকদ্যোতক শব্দাবলী। ব্যাপ্তিদ্যোতক দ্বিরুক্ত শব্দবন্ধ "গায়ে গায়ে" এবং বিশেষণ "সারা" র বিপরীতে আসে পৌনঃপৌনিকতাদ্যোতক দ্বিরুক্ত শব্দবন্ধ "নব নব"। প্রাথমিক পর্যালোচনার সময়ে আমরা বাক্য ও কলির বিন্যাসে সঞ্চারী অংশের ব্যতিক্রমী চরিত্রের কথা উল্লেখ করেছিলাম --- এখানে একটি বাক্য দুটি কলিতে ব্যাপ্ত। এই দৈর্ঘ্যের মধ্যে পরিসরের বিস্তৃতির সঙ্কেত ; অন্ধকার পরিসরের ব্যাপ্তি নয়, যে পরিসর জুড়ে আলো অন্ধকারের দ্বন্দ্ব চলে তারই ব্যাপ্তির প্রতিফলন --- এই দ্বন্দ্বের দৈর্ঘ্যের প্রতিফলন।

আলো-আঁধারের যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত সঞ্চারীতে, পরবর্তী দুই কলিতে অর্থাৎ আভোগের প্রথম দুই কলিতে তা তীব্রতম রূপ নেয়। দুই কলির শেষ প্রান্তে প্রতিসম অবস্থানে "কালো" ও "আলো"। কিন্তু ইতিপূর্বে সেই দ্বৈরথে জয়পরাজয়ের মীমাংসা হয়ে গেছে। প্রথম কলিতে "কালো"র আবির্ভাবের পূর্বে তার অবসান ঘোষিত হয়েছে ; সমান্তরালভাবে পরবর্তী কলিতে "আলো"র আবির্ভাবের পূর্বে তার বিস্তারের বাণীরূপায়ণ ঘটেছে। প্রথম কলিতে শুধুমাত্র একটি ক্রিয়াপদ অন্ধকারের বিদায় নির্দেশ করছে। পরবর্তী কলির আলোর ব্যাপ্তি নির্দেশ করছে পরস্পরসম্পৃক্ত স্থানদ্যোতক শব্দযুগল : "যেখানে... সেথায়"। এই কলির গঠনকৌশলটি পর্যালোচনাযোগ্য ; সঞ্চারীর নির্মাণকৌশলের সঙ্গে তা তুলনীয়। বিস্তৃতিদ্যোতক দ্বিরুক্ত শব্দবন্ধ "গায়ে গায়ে" ও সমগ্রতাদ্যোতক "সারা" বিশেষণপদের প্রয়োগে অন্ধকারের যে পরিসর মূর্ত হয়ে ওঠে তা দীর্ঘ কিন্তু সসীম। পক্ষান্তরে "যেখানে ... সেথায়" শব্দবন্ধের প্রয়োগে আলোর যে পরিসর প্রতিফলিত হয় তা অসীম। প্রাথমিক পর্যালোচনায় আমরা সঞ্চারীর প্রথম কলির এবং আভোগের দ্বিতীয় কলির ব্যতিক্রমী চরিত্রের কথা উল্লেখ করেছিলাম। সঞ্চারীর প্রথম কলিতে ক্রিয়ার অনুপস্থিতির কারণে অন্ধকারের দৃশ্যপটটি নিশ্চল দেখায়। অন্যদিকে আভোগের দ্বিতীয় কলিতে একটির বদলে দুটি ক্রিয়াপদের প্রয়োগে একটা অতিরিক্ত গতিময়তার সঞ্চার হয়। আলো শুধু সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয় না , সেই ব্যাপ্তি দ্রুত ঘটে।

আভোগের শুরুতে আছে "নয়ন"। লক্ষণীয় অন্তরায় "দেহ"এর ঠিক সমান্তরাল অবস্থানে আভোগে এসেছে "নয়ন"। কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে যেমন ঘটেছে, এবার তেমনভাবে উত্তমপুরুষের সম্বন্ধপদের উপস্থিতি নেই — "আমার...দেহের" স্থানে আসে "নয়ন"। পরবর্তী ক্ষেত্রে উত্তমপুরুষের অনুপস্থিতি চেতনার উন্মেষে ক্ষুদ্র আমিত্বের অবলুপ্তির সঙ্কেতবাহী। নয়নের দৃষ্টি এখানে শরীরী চেতনা নয় — এখানে নির্দেশ করা হয়েছে জ্ঞাননেত্রের উন্মীলন। বিশ্বপ্রকৃতির বিধানে দিন- রাত্রি, আলো-অন্ধকার আসে চক্রাকার আবর্তনে। কিন্তু মোহরজনীর বিদায়ে যে চেতনাপ্রত্যুষের অভ্যুদয় ঘটে, তার অবসান নেই।

শেষ কলিতে যাওয়ার আগে আমরা এই গানে প্রযুক্ত ক্রিয়াপদসমূহের রূপগত বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যালোচনা করব। প্রাথমিক পর্যালোচনাতে আমরা দেখেছিলাম দশটির মধ্যে প্রথম ছটি ক্রিয়ার অনুজ্ঞারূপ প্রযুক্ত হয়েছে, এবং বাকি চারটির সাধারণ ভবিষ্যতের রূপ। দেখা গেছে গানের বৃহত্তর অংশ জুড়ে বিস্তৃত আকাঙ্ক্ষাজগৎ। এই পরিসরে একটা স্তরবিন্যাস লক্ষণীয়। প্রথমে প্রার্থনাকারীকে প্রত্যক্ষভাবে উদ্দেশ্য করে প্রার্থনা উচ্চারিত ; তাই ছটি অনুজ্ঞার মধ্যে প্রথম চারটি মধ্যমপুরুষে প্রযুক্ত।এই স্তরে আমরা দেখেছি পর্যায়নুক্রমিকভাবে ব্যক্ত হয়েছে পরশ ও রূপান্তরের প্রার্থনা। পরবর্তী স্তরে প্রার্থনা ব্যক্ত হয়েছে কিন্তু প্রার্থনাপূরণকারী নেই। এখানে দুটি ক্রিয়ার অনুজ্ঞার প্রথম পুরুষ প্রযুক্ত হয়েছে। এখানে পরপর দুটি ক্রিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে আলোর উন্মেষের প্রার্থনা --- প্রদীপশিখা দেদীপ্যমান থাকার প্রার্থনা, তারপর নীরন্ধ্র অন্ধকারের বুকে নক্ষত্রদ্যুতিবিকিরণের প্রার্থনা। আকাঙ্ক্ষাবিশ্ব থেকে আমরা ঘটনাবিশ্বে উপনীত হই আভোগ অংশে। উক্ত ঘটনাগুলি আমরা প্রত্যক্ষ করি না, আমরা প্রতীক্ষা করি। প্রার্থনাপর্বের পর আসে প্রার্থনারূপায়ণের জন্য প্রতীক্ষার পর্ব। প্রথম পর্বের প্রার্থনাই কি গানের শেষাংশে রূপায়িত হয়েছে ? আকাঙ্ক্ষাবিশ্ব ও ঘটনাবিশ্বের মধ্যে প্রতিসাম্য সবচেয়ে স্পষ্ট হয় পঞ্চম ও দশম কলির

অর্থাৎ প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দুটি কলির তুলনামূলক পাঠে। কলিদুটিতে একই ক্রিয়া : জ্বলা /জ্বলে ওঠা। একই মর্মবস্তুর উপর নির্মিত উক্ত কলিযুগল — অগ্নিশিখাপ্রজ্বলন। প্রথমে অগ্নিপ্রজ্বলনের প্রার্থনা তারপর সেই শুভ মুহূর্তের প্রতীক্ষা ।

এই অগ্নিশিখা উপলক্ষ মাত্র — প্রকৃত লক্ষ্য পূজানিবেদন, আত্মহোমে বহ্নিজ্বালার প্রয়াস। এইক্ষেত্রে আমরা উত্তমপুরুষের প্রয়োগ সম্বন্ধে যা বলেছিলাম তার পুনরুল্লেখ করতে হয়। কেবলমাত্র উত্তমপুরুষের সম্বন্ধপদের রূপের ব্যবহার হয়েছে এবং এই প্রয়োগ ঘটেছে দুবার। এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ সম্বন্ধপদের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিশেষ্যপদযুগল। প্রথমার্ধে সম্বন্ধপদ "আমার" -এর সঙ্গে যুক্ত "দেহ" ; দ্বিতীয়ার্ধে সম্বন্ধপদ "মম"র সঙ্গে যুক্ত "ব্যথা" — হৃদয়ের অনুভূতি। সামগ্রিক পাঠে দেখা যাচ্ছে দেহ-মনের পূর্ণ নিবেদনে পূজা সম্পন্ন হয়। আমাদের আলোচ্য দুটি কলিতে রূপায়িত হয়েছে আরাধনার দুটি পর্ব — প্রথম পর্বে পূজার অর্ঘ দেহ, দ্বিতীয় পর্বে হৃদয়।

প্রথম পর্বের আরাধনা সুস্পষ্টভাবে একটা শরীরী, ইন্দ্রিয়গ্রাহী রূপ পরিগ্রহ করে। প্রথমে দেহের রূপান্তর ঘটে পূজার প্রদীপে, তারপর সেই দেহদীপে আলোকশিখা প্রজ্বলিত হয় । শেষে আত্মনিবেদনের গভীরতম অনুভূতি যখন ইন্দ্রিয়চেতনার পরতে পরতে উদ্বেল হয়ে ওঠে, তখনই ইন্দ্রিয়চেতনাজগতের আভ্যন্তরীন সীমারেখা অবলুপ্ত হয়ে যায় ---- যেমন আমরা দেখেছি দৃশ্য ও সঙ্গীতের মধ্যবর্তী বিভাজনরেখা অদৃশ্য হয়ে যায়। এরপর দ্বিতীয় পর্বে ইন্দ্রিয়চেতনাবলয় থেকে নিষ্ক্রমণ ঘটে। এই পরবর্তী পর্বকে রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষাতে "ব্যাথার পূজা"র পর্বরূপে অভিহিত করা যায়। এখানে মনে আসে এই গানটি :

আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে দিবস গেলে করব নিবেদন---
আমার ব্যথার পূজা হয় নি সমাপন।।[১৫]

আমাদের আলোচ্য গানে ব্যথার পূজার এই পর্বে "দুখের প্রদীপ" জ্বালানো হয় না। "দুঃখ" বা "ব্যথা"ই পূজার পবিত্র প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার রূপ নেয়। প্রথম পর্বের পর প্রদীপ বা অন্য কোন পূজার উপাচারের আর প্রয়োজন থাকে না। শুধু সমস্ত হৃদয় উজাড় করেই আরাধনা সম্পন্ন করা হয়। শেষ কলিতে "জ্বলা" ক্রিয়ার সঙ্গে রয়েছে দুটি উর্ধ্বগতিদ্যোতক শব্দ : "উঠবে" "ঊর্ধ্বপানে"। এই উত্তরণ ইন্দ্রিয় থেকে অতীন্দ্রিয়ে, রূপ থেকে রূপাতীতে। ইন্দ্রিয়চেতনায়, হৃদয়ব্যথায় যে পূজা সম্পন্ন হয়, রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষাতেই তার যথোপযুক্ত বর্ণনা মেলে ; মনে পড়ে "নটীর পূজা" নাটকের শেষ দৃশ্যে শ্রীমতীর গানের (বিচিত্র পর্যায়ের ১ নং গান) এই কলিটি

আমার সব চেতনা সব বেদনা রচিল এ যে কী আরাধনা..... । [১৬]

উল্লেখপঞ্জী:

১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : অখণ্ড গীতবিতান, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০১৩, পৃ ৯৪
২) তদেব, পৃ ৯৮
৩) তদেব, পৃ ৫৫
৪) তদেব, পৃ ৯১
৫) তদেব, পৃ ৯৮
৬) তদেব, পৃ ৩৫৫
৭) তদেব, পৃ ১৬২
৮) তদেব, পৃ ৬০ - ৬১
৯) তদেব, পৃ ৪৮৩
১০) তদেব, পৃ ৫৩৯- ৫৪০
১১) তদেব, পৃ ৩০০
১২) তদেব, পৃ ৯
১৩) তদেব, পৃ ৩০-৩১
১৪) তদেব, পৃ ২৮৩

১৫) তদেব, পৃ ৯০
১৬) তদেব, পৃ ৫৪৩

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

খাতুন, সনজীদা : রবীন্দ্রসঙ্গীত মননে লালনে, ঢাকা, নবযুগ প্রকাশনী, ২০১১
চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার : রবীন্দ্রসঙ্গীত-বীক্ষা : কথা ও সুর,কলকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৯৮৩
দাস, ক্ষুদিরাম : চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্র-বাণী, কলিকাতা, গ্রন্থনিলয়, বঙ্গাব্দ ১৩৭৩
রুদ্র, সুব্রত (সম্পাদিত) : রবীন্দ্রসঙ্গীত চিন্তা, কলিকাতা, আশা প্রকাশনী, ১৯৮০
রায়, আলপনা (সম্পাদিত) : রবীন্দ্রনাথের গান সঙ্গ অনুষঙ্গ, কলকাতা, প্যাপিরাস, ২০০১
সরকার, পবিত্র : দ্বন্দ্ববিরোধ : রবীন্দ্রসংগীতের এক সৃজনভিত্তি, গানের ঝরনাতলায়, কলিকাতা, প্রতিভাস , ২০১৩